



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 87 - 95

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মুর্শিদাবাদের বৈচিত্র্যময় ভাষাশৈলী : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প

ড. প্রিয়াঙ্কা প্রধান

Email ID : pradhanpriyanka103@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Rarh and Bagri area,
Murshidabad,
Regional languages,
Cultural differences,
Territorial
Boundaries, Rarhi,
Barendri and Bongali
Dialect.

Abstract

এই গবেষণামূলক নিবন্ধে আমার মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা হল, ছোটগল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে মুর্শিদাবাদের উপভাষা, বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ, প্রতিশব্দ তথা সমগ্র মুর্শিদাবাদের বৈচিত্র্যময় ভাষারীতি কীভাবে ধরা দিয়েছে তার সুলুকসন্ধান। এই গবেষণামূলক নিবন্ধকে বিস্তৃত করার জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি, কখনও কখনও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।

Discussion

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম ১৯৩০ সালে মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলস্থ খোশবাসপুর গ্রামে। এই জেলার মাটি, তার রূপ রস গন্ধ নিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। ফলে এই মাটি এবং প্রকৃতি নির্ভর জীবনকে তিনি চিনেছেন অত্যন্ত নিবিড় ভাবে। এখানের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, আচার, সংস্কার, মেলা-খেলা-উৎসব - এগুলি তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে তথা ছোটগল্পে। তাঁর কাছে গ্রাম মানে কেবল গাছপালা, নদী-পুকুর-মাঠ চাষের ক্ষেত নয়, তাঁর দৃষ্টিতে গ্রামীণ প্রকৃতি মানুষের আনকোরা রূপ ঐশ্বর্য অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। সরলতা, জটিলতা, হিংসা, কাম, ক্রোধ নিয়ে এই সব অখ্যাত গ্রাম্য নরনারীরা যেন 'অন্য আধুনিক'। মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র হিসাবে তিনি তাদের ছাপ রেখে গেছেন তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে। তাই তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের পটভূমি যেমন মুর্শিদাবাদের গ্রামবাংলা তেমনই গল্পের চরিত্রগুলিও এই মাটিরই ফসল।

যেকোনো সাহিত্যেরই প্রতিমা নির্মিত হয় মূলত দুটি উপাদানের সংযোগে - ১) ভাববস্তু ২) ভাষাবস্তু। লেখকের কাজ হল ভাবকে ভাষায় রূপ দেওয়া। লেখকের ভাবনাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষা হল প্রধান অবলম্বন। তাই ভাষাকে সাহিত্যের আধার বলা যায়। ভাষার মাধ্যমে যেকোনো কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা পাঠকের মনে জীবন্ত অভিজাত সৃষ্টি করে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে আমরা তার নিদর্শন পেয়েছি। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে কখনোই আমরা নাগরিক শব্দ



বা ভাষারীতির প্রয়োগ দেখি না। তিনি গ্রামীণ প্রথা সংস্কারে আবদ্ধ মানুষের জীবন, প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকা – এই কাহিনি ব্যাখ্যানে তিনি মুর্শিদাবাদের কথ্য বাংলাকেই হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

যেকোনো স্থানের ভাষারীতি তার রাষ্ট্রীয় সীমার উপর অনেকটা নির্ভর করে। মুর্শিদাবাদের মানচিত্রের দিকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে রয়েছে বর্ধমান জেলা, দক্ষিণ পূর্বে নদীয়া জেলা, পশ্চিমে রয়েছে বীরভূম এবং সাঁওতাল পরগনা, পূর্বে বাংলাদেশ এবং উত্তরে মালদা – একদিকে যেমন এখানের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই এখানের ভাষারীতিতেও এনেছে বৈচিত্র্য। এক্ষেত্রে বারংবার মুর্শিদাবাদের রাষ্ট্রীয় সীমার পরিবর্তনের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না –

“১৭৯৩ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এই জেলার সীমারেখা প্রশাসনিক কারণে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে – ড. খান মহম্মদ হোসেনের ‘A Bengal District in Transition: Murshidabad’ গ্রন্থের সূচনায় একটি মানচিত্রে এই পরিবর্তনের এলাকাগুলি দেখানো হয়েছে।

ক. ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তনের ফলে রাজশাহীর কিছু স্থলভূমি মুর্শিদাবাদের দিকে এসে যায় এবং ‘নীচু রাজশাহী’ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমাত্ত হয়। ১৮৫৭ সালে গঙ্গা, পদ্মা ও জলঙ্গি নদী মুর্শিদাবাদ জেলার সীমারেখা হিসাবে গৃহীত হবার ফলে মালদহ জেলার কিছু অংশ মুর্শিদাবাদে এসে যায়। ১৯২৫ সালে পদ্মার গতি পরিবর্তনে রাজশাহীর ৪টি গ্রাম মুর্শিদাবাদের সীমাত্ত হয়।

খ. ১৮৫৪-এ সাময়িকভাবে সাময়িকভাবে নওদা জলঙ্গি থানা নদীয়া জেলার করিমপুর সাব-ডিভিশনে যুক্ত হয়। ১৮৬৩ তে নদীয়া জেলার ৩৪টি গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় যুক্ত হয়।

গ. ১৮৫৪-৫৫ কালকাপুর ও ফারাক্কা থানা দুটি ভাগলপুর থেকে মুর্শিদাবাদে আসে। ১৮৫৭-এ সাঁওতাল পরগনা থেকে ৭টি গ্রাম মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঘ. মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে সর্বাধিক। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়ের ৬টি থানা (সমগ্র রাঢ়) বীরভূমে চলে যায়। ১৮৩৪-এ ভরতপুর থানা বীরভূমে যুক্ত হয়। ১৮৭৫-এ মুর্শিদাবাদের ১৭০টি গ্রাম বীরভূমে যায় এবং বীরভূমের ৩৯ টি গ্রাম এ জেলায় আসে। ১৮৭৯ তে বরোয়াঁ থানা (১০৮ স্কোঃ কিঃ মিঃ) বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ আসে এবং এ জেলার লালবাগ মহকুমার নলহাটি ও রামপুরহাট স্থায়ীভাবে বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত হয়।”^{১১}

একাধিকবার মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন, প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে অন্য বাংলা উপভাষা অঞ্চল এই জেলায় সংযুক্ত হয়েছে। যা এখানের ভাষারীতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। মালদার বরেন্দ্রী, পূর্ববঙ্গের বঙ্গালী, বিহারের হিন্দি, সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালি, – এই উপভাষা এবং ভাষাগুলি এই জেলার ভাষার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। এখানে রাঢ়ী, বঙ্গালী এবং বরেন্দ্রী – এই তিন উপভাষার উপস্থিতি আকর্ষণীয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে আমরা মুর্শিদাবাদের এই বৈচিত্র্যময় ভাষারীতির নিদর্শন পেয়েছি।

মুর্শিদাবাদের প্রায় মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়েছে ভাগীরথী নদী, যা মুর্শিদাবাদকে পূর্ব ও পশ্চিম – এই দুটি ভাগে ভাগ করেছে। পশ্চিম দিকের অংশটি ‘রাঢ়’ এবং পূর্ব দিকের অংশটি ‘বাগড়ি’ নামে পরিচিত। রাঢ় এবং বাগড়ি এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যেমন পরিবেশ প্রকৃতি, সমাজ, সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে তেমনই এখানে ভাষাগত পার্থক্যও বিদ্যমান। যেহেতু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অধিকাংশ ছোটগল্পের পটভূমি মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল তাই সেখানে রাঢ় অঞ্চলের ভাষারীতিরই অধিক প্রয়োগ ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্পের শুধু চরিত্রেরা নয়, গল্প কথক নিজেও সচেতন ভাবে রাঢ়ের কথ্য বাংলায় ভাব প্রকাশ করেছেন। মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকাকে কথ্য ভাষা ব্যবহারের সূত্রে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় –



ক. ফরাঙ্কা - সমসেরগঞ্জ - সুতি থানা : এই অংশটি বিহারের সীমান্ত সংলগ্ন। এখানে হিন্দি এবং উর্দুভাষী বহু মানুষ আছেন। অতীতে একাধিকবার ভাগলপুরের সঙ্গে এখানের সীমান্তের পরিবর্তন হয়েছে। তাই এখানের কথ্য বাংলায় হিন্দি ভাষার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন - এখানে ‘আমি’ শব্দের উচ্চারণ হয় ‘হামি’, আমাকে > হামাকে এবং এই অঞ্চলের কথ্য বাংলায় প্রচুর হিন্দি ও উর্দু শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে এবং কথায় হিন্দির টান আছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘পেছনে পায়ের শব্দ’ গল্পে আমরা ‘ফরাঙ্কা-সমসেরগঞ্জ-সুতি’ ভাষা বলয়ের প্রভাব দেখতে পাই। এখানের কথ্য বাংলায় যেমন হিন্দির টান রয়েছে তেমনই বহুল হিন্দি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় গল্পটিতে। যেমন— আঠান্নি (আটান্ন), জেব (পকেট)। চরিত্রের সামাজিক পরিচিতি অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন। একই গল্পে তিনি যখন হিন্দিভাষী দাতুয়ারি সিং সম্পর্কে কথা বলেছেন তখন তাঁর ভাষায় হিন্দি শব্দের আধিক্য দেখা যায়। আবার যখন বাংলাভাষী বিপিন সম্পর্কে কথা বলেছেন তখন তা মুর্শিদাবাদের কথ্য বাংলাতেই বলছেন। যেমন - দাতুয়ারি সিং-এর পঞ্চাশ পয়সা হারানো প্রসঙ্গে লেখককে বলতে শোনা যায়—

“সকালবেলা অফ ডিউটির সময় বাজারের মোড়ে ট্রাক ড্রাইভার মদন তাকে একটা আঠান্নি উপহার দিয়েছিল। একেবারে নতুন চকচকে পয়সা।”^২

“তাহলে জেব থেকে জিনিসটা গেল কোথায়?”^৩

অন্যদিকে বিপিনের পোশাক সম্পর্কে লেখক যখন কথা বলেছেন তখন তাঁর কথায় কোনো হিন্দি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। বরং সেই অঞ্চলের কথ্য বাংলা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

খ. রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর্ সাগরদিঘি থানা : এখানে কথ্যবাংলায় হিন্দির প্রভাব অনেকটাই কম। এই অঞ্চলের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে শব্দের অক্ষর বিশেষে উচ্চারণে জোর পড়ে। অনুনাসিক ধ্বনির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন- হাসি > হাঁসি

সাপ > সাঁপ

“এই কথ্যভাষাটির প্রসার মালদহ শহর পর্যন্ত। সাধারণ মানুষ এটিকে জঙ্গিপুর্ ভাষা বলে জানে। কিন্তু এই কথ্যরীতিটির আদর্শরূপ রঘুনাথগঞ্জেই লভ্য।”^৪

এই অঞ্চলের সীমান্তে রয়েছে বরেন্দ্রী উপভাষার উপস্থিতি। তাই তারও কিছুটা প্রভাব এখানে পড়েছে। এই রীতির উচ্চারণে এক বিশেষ কাঠিন্য আছে। এবং শব্দান্তে রয়েছে সুরের রেশ। যেমন -

১. এখানে শব্দে ‘উ’ -এর আধিক্য লক্ষণীয়।

আমন > আমুন

ননদ > নন্দু

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘ন’ ধ্বনি ‘ল’ -এ রূপান্তরিত।

নিয়ে > লিয়ে

নাতি > লাতি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অস্থানে অন্নের স্থাণ’ গল্পে আমরা এই ভাষারীতির দৃষ্টান্ত পেয়েছি। গল্পের পটভূমি মুর্শিদাবাদের গুণুটিয়া অঞ্চল। রাঢ়ের অন্যতম উৎসব নবান্নকে কেন্দ্র করে এই গল্প রচিত হয়েছে। পিতৃহারা চিরুণীদের জমি জিরেত নেই তাই সে মাসির বাড়ি নবান্ন খেতে যায় - মাসির বাড়ি নবান্ন খেতে যাওয়া প্রসঙ্গে চিরুণীকে বলতে শোনা যায়—



“আমাদের জমি জিরেত নাই তো। তাই লবান করতে মাসির বাড়ি যাই। আঘুন মাসে লতুন ধান ওঠে। উঠোনে গোবরছড়া দেয় মাসি। আঙামাটি দিয়ে ঘরের দেওয়াল লাল করে। লতুন আতপ চালের আটা গুলে পদ্ম ফুল আঁকে মাসি। মা লক্ষ্মীর পা আঁকে। আম্মো সেবার মাসির সঙ্গে এঁকেছিলাম।”^৫

অনুচ্ছেদটিতে দেখা যায় ‘অম্মাণ’ শব্দটি আঞ্চলিক উচ্চারণে ‘আঘুন’ হয়েছে।

লতুন হয়েছে ‘লতুন’
 আঙামাটি > আঙামাটি
 আমি > আম্মো

এই বিশেষ উচ্চারণ রীতি জঙ্গীপুর, সাগরদীঘি অঞ্চলে দেখা যায়। তাই এখানের গল্প বলতে গিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ চরিত্রের মুখে এই অঞ্চলেরই কথ্যভাষাকে বসিয়েছেন।

গ. বরোয়াঁ, খড়গ্রাম, কান্দি এবং নবগ্রাম (পশ্চিম অংশ) থানা : এখানের জনসংখ্যায় হিন্দু গরিষ্ঠতা রয়েছে এবং তপশিলি সম্প্রদায়েরও সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া বায়েন, বাগদি, হাড়ি, বাউরি প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকেও দেখা যায়। ফলে এই অঞ্চলগুলিতে কথ্য ভাষায় অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। ফরাক্কা, জঙ্গীপুর অঞ্চলের কথ্য বাংলার সঙ্গে এখানের ভাষার অনেকটাই পার্থক্য।

“এই উপভাষায় সাঁওতাল পরগণার অস্ট্রিক প্রভাব, বীরভূমের এবং বর্ধমানের রাঢ়ী উপভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে ফরাক্কা সামসেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গীপুর থানার সমগ্র অঞ্চল এবং রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, লালগোলা ও ভগবানগোলার একাংশে হিন্দি ও উর্দু ভাষার মিশেল এবং বরেন্দ্রী উপভাষার প্রভাব রয়েছে।”^৬

অস্ট্রিক ভাষার প্রভাবে এখানে তু (তুই/ তুমি), মু (আমি), ‘বট’ প্রভৃতি শব্দের অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ‘হতে’ শব্দের বদলে ‘হোৎকে’ শব্দের ব্যবহার করা হয়। এখানের ভাষারীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কথ্যবাংলায় ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত হয় এবং স্বরসঙ্গতি ঘটে। যেমন—

গিয়েছে > গেছে
 খেয়েছে > খেছে
 করলাম > কল্যাম
 বললাম > বল্যাম।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অধিকাংশ ছোটগল্পই এই ভাষাবলয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ‘কাঁটা’, ‘বাগাল’, ‘গোয়’, ‘বুঢ়াপীরের দরগাতলায়’ প্রভৃতি গল্পে আমরা এর দৃষ্টান্ত পেয়েছি। ‘কাঁটা’ গল্পে বুড়োশিব এবং কুড়োনি বুড়ি মাসির কথোপকথনে পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের ভাষারীতি ধরা পড়েছে। বুড়োশিবের পায়ে কাঁটা ফোটার প্রসঙ্গে তাদের বলতে শোনা যায়—

“বুড়ো শিব বলল ‘কাঁটা বলছ বটে, মাসি। কাঁটা ফুটলে কি জানতে পারতাম না? কাঁটাও লয়।’
 মাসি বলল, ‘চোখে আর তত সোজে না। তমু একবার দেখি দেকিনি।’^৭

এখানে ‘ন’ ধ্বনির ‘ল’ ধ্বনিতে রূপান্তর এবং ‘বট’ শব্দের প্রয়োগ মুর্শিদাবাদের পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের ভাষাবৈশিষ্ট্যই বহন করেছে। তাঁর ‘বাগাল’ গল্পেও আমরা ঠিক একই রকম ভাষারীতির ছবি দেখতে পাই। ধানু মোড়ল, মোড়ল গিন্দি, হরিবুলা, রাঙাদাসী - প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপেই রাঢ়ের ভাষা বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

দৃষ্টান্ত : নিরুম দুপুরে মোড়লের টেঁকিতে গা দিতে দিতে রাঙাদাসী গুনগুন করে গান গাইতো। তার গান নিয়ে মোড়ল গিন্দি এবং রাগদাসীর কথোপকথন—



“মোড়লগিন্মি কান করে শুনে বলত, ‘গাইবি তো ঝেড়ে গা দিকিনি বাপু!’ রাঙাদাসী খতমত খেয়ে বলত, উ কিছু লয় গিন্মিমা।”^৮

এদের কথা বলতে গিয়ে লেখক নিজেও এই ভাষারীতিরই ব্যবহার করেছেন। ‘রেশন কার্ড’, ‘কেরোসিন তেল’, ‘নরেন্দ্র মাস্টার’ প্রভৃতি শব্দগুলি এই রাঢ়ের কথ্যরীতিতেই তিনি উচ্চারণ করেছেন—

“হরিমতী রাশংকাডে হয়েছিল রাঙাদাসী। সেই রাশংকাড ধানু মোড়লের জিম্মায় আছে। চিনিটা আর ক্যারাচতলটার খুব আকাল পাড়াগাঁয়ে লেগেই আছে, লরেন্দ মাস্টের ডিলার।”^৯

এভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অঞ্চলভেদে রাঢ় মুর্শিদাবাদের ভাষারীতির সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে শুধু চরিত্রেরা নয়, গল্পকথক নিজেও মুর্শিদাবাদের কথ্যভাষারীতি অনুসরণ করেছেন। তাই একদিকে যেমন কথ্যবাংলার সংলাপ গল্পগুলিকে, গল্পের চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে তেমনি পাঠককেও আকর্ষিত করেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনার অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর নিপুণ অর্থভেদী শব্দচয়ন। আর তাঁর এই বিশেষ গুণই তাঁর রচনাকে সাহিত্য শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ শব্দাবলী তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তাঁর ছোটগল্পে আমরা তাঁর সেই দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি। মুর্শিদাবাদের মাটি, সমাজ, মানুষ তাদের সুখ-দুঃখের আখ্যান লিখতে গিয়ে তিনি বারংবার মুর্শিদাবাদের কথ্যভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন। এই আঞ্চলিক ভাষার হাত ধরেই উঠে এসেছে আঞ্চলিক শব্দ। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আঞ্চলিক শব্দের, অজানা শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি বিষয় আমাদের চোখে পড়ে।

১) আঞ্চলিক প্রভাবে সমর্থক একই শব্দের পৃথক উচ্চারণ ২) প্রত্যাশিত বা পরিচিত অর্থে পৃথক ও অপরিচিত শব্দবন্ধের ব্যবহার। যেমন - ‘কোথায়’ শব্দটি সাধারণত কোন জায়গায় বলতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই শব্দটিই মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়।

বড়এগা থানা অধ্যুষিত অঞ্চল— কোথায় অর্থে ‘কোতা’ শব্দের ব্যবহার করা হয়।

খড়গ্রাম থানা অধ্যুষিত অঞ্চল— কোথায় অর্থে ‘কোতি’ শব্দের ব্যবহার করা হয়।

ভরতপুর থানা অধ্যুষিত অঞ্চল— কোনরু শব্দ ব্যবহৃত হয়।

লালগোলা থানা অধ্যুষিত অঞ্চল— ‘কুঠায়’ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ভাগীরথীর পূর্ব তীরস্থ বাগড়ি অঞ্চল— ‘কুনঠে’ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

আবার অন্যদিকে অঞ্চলভেদে এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থও আমরা লক্ষ্য করি। যেমন - ‘খাদাল’ শব্দটি নবগ্রাম থানায় এলাকায় বুড়ো গরু বলতে ব্যবহার করা হয়। আবার বড়এগা থানার ‘খাদাল’ বলা হয় মরা আখকে। আর খড়গ্রাম থানার এলাকায় যে বেশি খেতে পারে তাকে ‘খাদাল’ বলা হয়। ‘ফের’ শব্দটি বড়এগা থানায় বিপদ বা সমস্যা বলতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সালারে ‘ফের’ বলতে কূল-কিনারা বোঝানো হয়ে থাকে। এর ঠিক বিপরীতে একই অর্থযুক্ত শব্দ অঞ্চল বৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দরূপ লাভ করে - এই দৃষ্টান্তও আমরা মুর্শিদাবাদে দেখতে পাই—

“প্রচলিত বাংলা শব্দ খুস্তি বোঝাতে সামসেরগঞ্জ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, ডোমকল ইত্যাদি থানায় বলা হয় ছেঁচকি বা চ্যাঁচকা। নবগ্রাম থানায় খুঁজে দেখা বলতে বলা হয় হেঁটকে দেখা। সামসেরগঞ্জ থানায় আখকে বলে কুশর (ভিন্ন প্রদেশাগত)। খড়গ্রাম থানায় শীত অর্থের ঠার শব্দ প্রযুক্ত হয় (যেমন খুব ঠার লাগছেরে)। বড়এগা থানায় শীত অর্থে শোনা যায় (খুব জার লাগছেরে)।”^{১০}

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজেও তাঁর ছোটগল্প বয়ানে মুর্শিদাবাদের এই বৈচিত্র্যময় ভাষারীতিকে ধরে রাখতে অনেকটাই সফল হয়েছেন। অঞ্চল ভিত্তিতে শব্দের রূপগত যে পরিবর্তন তা তিনি সুদক্ষতায় ব্যবহার করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। ‘গোয়ল’ গল্পে বাগড়ির হারাই এবং রাঢ়ের পিরিমল বদ্যির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক মুর্শিদাবাদের রাঢ় এবং বাগড়ির ভাষাগত পার্থক্যকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন। রাঢ়ে এসে হারাইয়ের পোষ্য গোরু ধনা অসুস্থ হয়ে পড়লে সে তাকে গোবদ্যি



পিরিমলের কাছে নিয়ে আসে। ধনার চিকিৎসার জন্য হারাইয়ের কাছে পিরিমলের বালতি চাওয়ার প্রসঙ্গে তাদের কথোপকথন -

“ওরে, বালটিন আছে সঙ্গে?

হারাই ব্যস্ত হয়ে বলে - ডোলচি আছে।

পিরিমল খিক খিক করে হাসে। তোর বুলিচ ডোলচি, আমরা বলি বালটিন। একই কথা।”^{১১}

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সুকৌশলে চরিত্রের সংলাপের মধ্যদিয়েই রাত্ এবং বাগড়ি এই দুই অঞ্চলের ভাষার বৈচিত্র্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে আঞ্চলিক শব্দের বাহুল্য গল্পগুলিকে যেন এক অন্যমাত্রা দিয়েছে। গল্পগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। তাঁর ছোটগল্পে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারা লক্ষ করা যায়। তিনি কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবন সংক্রান্ত আখ্যান যখন লিখছেন, তখন তাঁর লেখায় কৃষিকাজ বিষয়ক নানান আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশি দেখি। আবার যখন আমরা তাঁর গো-পালনকেন্দ্রিক বা গোরু সংক্রান্ত আলোচনার গল্পগুলি দেখি তখন সেখানে গোরু সম্পর্কিত নানান আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার দেখি। প্রকৃতির বৈচিত্র্য সংক্রান্ত গল্পেও একই রীতিতে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন তাঁর কৃষিভিত্তিক ছোটগল্পগুলিতে আমরা ‘মড়াই’, ‘খুরপি’, ‘দোনা’, ‘হালসাল’, ‘মাহিন্দার’, ‘মুনিশ’, ‘বাগাল’, ‘চৈতালি’, ‘বীছন’ প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দগুলি পেয়েছি। যার অর্থগুলি হল—

মড়াই — ধানের গোলা।

খুরপি — ফসল কাটার যন্ত্র।

দোনা — জমিতে জল সেচ করা।

বীছন — ধানের বীজ।

চৈতালি — চৈত্রের ফসল।

হালসাল, মাহিন্দার, মুনিশ, বাগাল — কৃষিকাজে সাহায্যকারী শ্রমিক বিশেষ।

কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গবাদি পশুরা। হালচাষ থেকে শুরু করে মানুষের যাতায়াত সবক্ষেত্রেই গোরুর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় গ্রামবাংলায়। গোরু, গোরুর গাড়ি ব্যবহার সম্পর্কিত নানান প্রতিশব্দ তিনি তাঁর ছোটগল্পে ব্যবহার করেছেন যেগুলি শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের গ্রাম বাংলাতেই ব্যবহার হয়। যেমন— লিক, পাচন, পেহা, পাঘা, পালহাল প্রভৃতি। এগুলি অর্থ হল—

লিক- গো-যানের পথ।

পাচন- গোরু ঠ্যাঙানো লাঠি বিশেষ।

পেহা- গোরুর গাড়ির চাকা।

পাঘা- গোরুর দড়ি।

পালহান- গোরুর বাঁটের উপরিভাগ।

তাঁর উড়ো চিঠি গল্পে আমরা এরকম অনেক শব্দের ব্যবহার পেয়েছি—

“এই কালুডিহির চারিদিকে ছিল বড় বড় মাঠ, খালবিল আর ওই নদী। না সড়ক, না কিছু। আলপথে গাঁয়ে আসা যাওয়া। শীতে মাঠের ধান উঠলে তখন আল কেটে কেটে গোরু মোষের গাড়ি চলার ‘লিক’ বানাত।”^{১২}

“ওই বুড়িতে জল ঝরার সাধি নেই। বড় কৌশলে তৈরী। ওতে **জাবনা** খাবে মোষ দুটো, ওহিদ বলল—
 ‘পোঁহাত কালে জায়গা মতো গাড়ি বেঁধে একবার খাওয়াবে। অভ্যেস আছে বাছাদের। আর সেই বিলাতী
 লঠন ঝোলানো হল গাড়ির তলায় **ধুরিতে**।”^{১০}

তাঁর ছোটগল্পে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি একদিকে যেমন গল্পগুলির পটভূমি অঞ্চল নির্দেশ করছে অন্যদিকে পাঠকের মনেও নতুন শব্দ জানার কৌতূহলকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অচেনা শব্দের ব্যবহার করে সাহিত্যে চমক সৃষ্টি করা। তিনি কেবলমাত্র চরিত্রের বয়ানেই আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ঘটান নি, তিনি নিজেও মুর্শিদাবাদের গ্রামবাংলার মানুষের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি তিনি যে সকল আঞ্চলিক শব্দ তাঁর ছোটগল্পে ব্যবহার করেছেন সেই শব্দগুলোর পাশে তিনি তাঁর অর্থও ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কখনও বা লেখক নিজেই কাহিনি বলার ভঙ্গিতে সেই আঞ্চলিক শব্দগুলির অর্থ আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। তাঁর ‘বুড়াপীরের দরগাতলায়’ গল্পে বৃন্দাবন ও তার ছেলে নির্মলের মধ্যে কথোপকথন —

“তাঁর বাবা হাঁক দেয়, কার সঙ্গে খেলছিস বাছা? জুড়িটা কে তুর গুনি? সে একটু হেসে ফের বলে, মনিষি না **বাউর**?

বাউর মানে কুবাতাস। বুড়াপীরের দরগাতলা এইসব কুবাতাস এসে ঘুরঘুর করে।”^{১১}

আবার ‘বৃষ্টিতে দাবানল’ গল্পে আমরা দেখি লেখক বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে যে সকল আঞ্চলিক শব্দ মুর্শিদাবাদের রাঢ় বাংলায় প্রচলিত সেই শব্দগুলির ব্যবহার করছেন এবং নিজেই তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে সমগ্র পাঠক সমাজকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই যেন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। এখানে বৃষ্টির আবহাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

“এই বৃষ্টির নাম টিপটিপানি, আবহাওয়ার নাম **গাজোল**। আকাশ নিভাঁজ মেঘে ঢাকা, হাওয়া নেই। তাই বৃষ্টির ফোঁটা সোজাসুজি পড়ছে। যদি হাওয়া দিত এবং ফোঁটাগুলো একটু কাত হয়ে পড়ত, নারাংয়ের দাওয়ার মাটি অনেকটা ভিজত, তাহলে এই আবহাওয়ার নাম হত **ডাওর**। **ডাওর** বাড়লে তার নাম **ফাঁপি**। সে খুব ভয়ংকর।”^{১২}

এছাড়া তাঁর ‘বুড়াপীরের দরগাতলায়’, ‘বৃষ্টিতে দাবানল’, ‘বাগাল’, ‘অক্রুরের গল্প’ প্রভৃতি ছোটগল্পেও আমরা তাঁর এই বিশেষ ভাষারীতির দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রামকেন্দ্রিক গল্পগুলিতে দেখা যায় শুধুমাত্র গল্পের চরিত্ররাই যে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার কথা বলছে তা নয় গল্পের কথকও কাহিনি বয়ানের ক্ষেত্রে অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষাতে কথা বলেছেন। এমনকি লেখক নিজেও যখন কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তখনও তাঁর বয়ানে বেশকিছু আঞ্চলিক শব্দ এবং শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তাঁর ‘অঘ্রাণে অল্পের ঘ্রাণ’ গল্পের কথক তিনি নিজেই। এবং তাঁর সংলাপে আঞ্চলিক কথ্যভাষার ছোঁয়া রয়েছে। গল্পের শুরুতে কথক তথা লেখক গল্পের অন্যতম চরিত্র বনমালীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

“অঘ্রাণ মাসের সকালবেলায় ভাপ-ওঠা স্বাদু ভাত খেয়ে ধনহরি মোড়ল যাবে শালার বাড়ি ধামালিতলায়। শালার নাম বনমালী। **কবরেজ**ও বটে, গুনিও **বটে**। আধিব্যাধির ওষুধ দেয়, আবার ভূতও ছাড়ায়। তবে ধনহরির যাওয়ার কারণ গরু। তিনদিন আগে **সোমন্ত** বকনাটা নদীর ধারে চরতে গিয়ে পালছাড়া হয়ে নিখোঁজ। মোড়লের মনে সুখ নেই। রাখাল ছোড়াটাও ভয়ে বাড়ি ছেড়েছে।”^{১৩}

এখানে ‘কবিরাজ’-এর পরিবর্তে ‘কবরেজ’, ‘সমর্থ’ শব্দের পরিবর্তে ‘সোমন্ত’, ‘বটে’ শব্দের ব্যবহার - এগুলি মুর্শিদাবাদের গ্রামবাংলার কথ্যভাষা রীতিতে লক্ষ করা যায়। লেখক নিজেও তাই মুর্শিদাবাদের গ্রাম বাংলার পটভূমিতে লেখা গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার কথ্যভাষাকে নির্বাচন করেছেন। তাঁর ‘হেবজু, নারাংবাবু ও মাকড়াডোমের বৃত্তান্ত’, ‘প্যাটলার’, ‘উড়োচিঠি’,



‘দারুশ্রমকথা’, ‘সাতার বৃত্তান্ত’, ‘কাঁটা’, ‘হিজল বিলের রাখালেরা’ প্রভৃতি গল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেখানে তিনি নিজে গল্প কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সেখানে তিনি গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে রাঢ়ের কথ্যবাংলাকে আশ্রয় করেছেন—

ক) ‘মাকড়া বাউড়ির বউ আলোপুরী বিলখাল জঙ্গল কুড়িয়ে বেঁচে থেকেছে এতকাল এবং আজও বেঁচে থাকার জন্যে চলে এসেছে। তার কাঁখে একটা বুড়ি। বুড়িতে কলমি শাক আছে। শুকনো কাঠকুটো আর গরুর নাড়ি আছে। তার কোঁচরে শামুক, গুগুলি আর চুনোমাছ আছে।’ (হেবজু, নারাংবাবু ও মাকড়া ডোমের বৃত্তান্ত)

খ) ‘পাঁচু এখন টঙে আছে। এ সময়টা তার মতো সকল প্যাটলারের টঙে থাকার সুসময়। দিনমান গতরের রক্ত জল করে বিকেলের মুখে বাড়ি ফেরার সময় সিংজী মশাই-এর শুঁড়িখানার সামনে, যেখানে একটি পুরনো মহীরহ আছে, তার তলায় এলাকার প্যাটলাররা জাঁকিয়ে বসে এবং টঙে চড়তে থাকে।’ (প্যাটলার)

গ) ‘বিলাঞ্চলের নাবাল মাটির গাঁ কালুডিহিতে ঘরবিশেক বসতি বড় জোর। সবাই সবার আশু কুটুম্ব কোনো না কোনো সূত্রে। সুখে দুঃখে এককাটা হয়ে বেচে থাকে। মোট ভাত কাপড়ে তুষ্ট লোকজন, শৌখিনতা সয় না। এমন এক গাঁ।’ (উড়ো চিঠি)

ঘ) ‘গঙ্গাহাটির সেই পাখিডাকা দিনগুলিন আর শেয়ালডাকা রাতগুলিন কোথায় গেল?’ (দারুশ্রমকথা)

ঙ) ‘কাজে বেরুনের আগে কালু মিস্ত্রি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে মূর্তিমান অযাত্রা। গোপ গাঁয়ের যশো। সেই সাবেকি চেহারা। রোগাটে কেটো গড়ন। মাকুন্দে মুখ।’ (সাতার বৃত্তান্ত)

চ) ‘বউকে বুড়ো শিবের মনে পড়ে না। সেই কবে বাচ্চা বিয়োগে বাপের গাঁয়ে গেল, আর ফিরল না। সেও বড় দুখের বছর ছিল।’ (কাঁটা)

ছ) ‘শব্দটা সূচের মত মিহি আর ধারালো। কানের ভেতরে বেঁধে। অনেকটা দূর থেকে আসছে। মাথা তুলেও ঠাণ্ডা করা যায় না।’ (হিজল বিলের রাখালেরা)

লেখক গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে কখনও মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা, কখনও বা আঞ্চলিক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি ‘কোমরে’ অর্থে ‘কাঁখে’, ‘আঁচল’ অর্থে ‘কোঁচড়’, ‘শুকনো গোবর’ অর্থে ‘গরুর নাড়ি’, ‘দিনরাত’ অর্থে ‘দিনমান’, ‘শরীর’ অর্থে ‘গতর’, ‘বাচ্চা হওয়া’ অর্থে ‘বিয়োগে’, ‘বুঝতে পারা’ অর্থে ‘ঠাণ্ডা’, দেবী করে ফসল ফলে যে মাটিতে সেই মাটিতে বোঝাতে ‘নাবাল মাটি’ প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করেছেন যা মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে কথ্যভাষা ব্যবহারে দেখতে পাওয়া যায়। আবার ‘দিনগুলো > দিনগুলিন’, ‘রাতগুলো > রাতগুলিন’, ‘বেরোনে > বেরুনে’ - লেখকের বয়ানে এই ভাষারীতি মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলের ভাষাবৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব শুধু লেখকের গল্প বয়ানের ক্ষেত্রে নয়, চরিত্রের নামের উপরেও পড়েছে। তিনি নিজেও চরিত্রগুলির নামের আঞ্চলিক উচ্চারণ করেছেন। যেমন ‘গোয়াল’ গল্পের অন্যতম চরিত্র পরিমল, তা আঞ্চলিক উচ্চারণে ‘পিরিমল’ হয়েছে। লেখক তাঁর পরিচয় দিয়েছেন পিরিমল বন্দি হিসাবে -

“যেতে যেতে তিন পুরুষের নামধাম গরু দুটোর জীবনচরিত জেরা করে জেনে নেয় পিরিমল বন্দি। তারপর অর্জুনতলায় গিয়েই লাফিয়ে ওঠে।”^{১৭}

‘বুঢ়াপীরের দরগাতলায়’ গল্পেও দেখা যায় লেখক গল্পের অন্যতম চরিত্র বন্দাবনকে সমস্ত গল্প জুড়ে ‘বন্দাবন’ নামে সম্বোধন করেছেন -

“তার বাবা অন্ধ বন্দাবন হাত পেতে বসে আছে দরগাতলায় দিনমান। পীরবাবার আর মাহাত্ম্য নেই। কদাচিৎ ভক্তজন এসে সিন্ধিটা দেয়। লোবান-কাঠিটা জ্বালে। বন্দাবন ধরা গলায় বলে, বুঢ়াপীরের দয়া লাগে অন্ধকে একটা-দুটো পয়সা।”^{১৮}

লেখকের গল্প কথনে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দের ব্যবহার দেখে মনে হয় লেখক যেন গল্পের কাহিনির সঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে উঠেছেন। তিনি চরিত্রদের আঁতের কথা তাদের ভাষারীতিতে প্রকাশ করেছেন। ফলে গল্পগুলি পড়তে গিয়ে পাঠকের কখনও কখনও মনে হয় যেন কথকও গল্পের কোনো চরিত্র বিশেষ। লেখকের কথনরীতিতে



মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহার এমনকি চরিত্রের নামেরও আঞ্চলীকরণ তাঁকে যেন গ্রাম বাংলার ধুলোমাটিতে বেড়ে চরিত্রগুলির একজন করে তুলেছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখতে পারছি কথাসিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃত অর্থেই মুর্শিদাবাদের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। শুধুমাত্র আখ্যানভাগ নয়, এর ভাষারীতি জুড়েও রয়েছে মুর্শিদাবাদ। কালের নিয়মে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ এবং উপভাষাগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক ভাষার দিকে এগিয়ে চলেছে নবীন প্রজন্ম। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পগুলি সেই হারিয়ে যাওয়ার চিহ্ন বহন করছে নবীন প্রজন্মের কাছে।

Reference:

১. চৌধুরী, কমল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৬১
২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৯৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
৪. চৌধুরী, কমল, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৬৪
৫. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৯
৬. বিশ্বাস, নুরুল আমিন, মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৬
৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, করুণা প্রকাশনী কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৩৫
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮
৯. পূর্বোক্ত
১০. দে, গদাধর, মুর্শিদাবাদের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষা, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২০৮
১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৯৯
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
১৪. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০২
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮
১৬. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৭
১৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৯৯
১৮. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০২